প্রবন্ধ

কালান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

• 2021 •

সূচিপত্র

- কালান্তর 3
- বিবেচনা ও অবিবেচনা 15
- লোকহিত 25
- লড়াইয়ের মূল 37
- ছোটো ও বড়ো 41
- বাতায়নিকের পত্র 66
- শক্তিপূজা 97
- সত্যের আহ্বান 101
- সমস্যা 125
- সমাধান 147
- শূদ্রধর্ম 153
- বৃহত্তর ভারত 160
- হিন্দুমুসলমান 169
- নারী 174
- কর্মযজ্ঞ 183
- চরকা 190

- নবযুগ 206
- প্রচলিত দণ্ডনীতি 211
- রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত 217
- রায়তের কথা 227
- শক্তিপূজা 238
- স্বরাজসাধন 242
- স্বাধিকারপ্রমত্তঃ 253
- স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 265
- হিজলি ও চট্টগ্রাম 272
- হিন্দুমুসলমান 276

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে-আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবন-যাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল– কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে

সর্বত্রই প্রচলিত ছিল ফার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই ফার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি- একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে ফার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বদ্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে- তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়াছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব-চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে- কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির ‘পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না- এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চারিদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান- কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ-কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান- আমলের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হারজিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ সেই নিয়মকে লজ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্রোপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা’, এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ-কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি

মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ-কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে,"A man is a man for a that"।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে– অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠোরোশো খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ-কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই

ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উলটো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুন্ন হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্লাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজচরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা

করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ ব'লেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেন-না দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মনি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র ল এবং অর্ডর বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি– এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে “মায়া’ জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে

দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের Strangling of Persia বইখানা পড়লে। ওদিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী-রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্‌ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদুরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা

য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খ্রিস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম লিখছেন:–

So after the war I was sent to Guiana...Condemned to fifteen years penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment– banishment for life। One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves) weakly, old, ill।।।One arrives in Guiana honest– a few months later one is corrupted...They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land– fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all leprosy।

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কীরকম দুঃসহ নরকবাস, সে-কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের ‘পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে– বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত

দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুদিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এসব হয় নাই- কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারও পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে-লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, “তোমরা মরিতে বসিয়াছ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ- তোমরা স্থূলের উপাসক।” এ-সব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, “হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি- ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।” এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেন-না, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, এ-কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে- বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এইজন্য, নিষ্কমণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব-চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া। তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এ-স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বকশিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, “হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।”

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তরের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেন-না অন্যথা

করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব-চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য– কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে-সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক– বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কী! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, “রোস রোস’, প্রাণ বলিতেছে, “দেখাই যাক-না’ ।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে। আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতিসঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ংকর তাহা মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে-পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জটি সেখানে একা স্থাণু হইয়া ঊর্ধ্বনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গানিতেছেন– কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া। নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে।

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে- এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর-এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে,- মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালুচাপা পড়িয়া গেছে। এখানে-সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো একটা ভাঙাটুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী। সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাইতেছে।

চারিদিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনোই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহুপূর্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত- সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাইকরা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না- তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেন-না তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁত নয়, নিটোল নয়; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত “মমি’ মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন। তাহাদের সিন্দুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্ না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে “ফেলাহীন্’ চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে

প্রাণের ছোটো ভাই; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে– যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর-কিছুই নাই;– কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে-দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তায় স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য

ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত এ-কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই। নিশ্চয় আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব- চেয়ে ভয় করে- সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ-সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস,মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনসংকেতে ওঠ্‌বোস্‌ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল।

ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে।

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর-কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব-চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এ-দেশে জন্মিয়া সে-কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন- এইজন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর-কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, “স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,” আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব-চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়দাড় শব্দে ঘরের দরজাজানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,- মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে-পথে চলাফেরা বন্ধ, সে-পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে-ঘাস সে-ফুল সুন্দর এ-কথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

১৩২১

লোকহিত

লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা।

এ-কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ– যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ– এ-

উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে-রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে-রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে-সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে-সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান;- সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে-কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ-সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না- সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই– সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না-হয় শোভন।

হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে– তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই- আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধুলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে-ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ-কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান-নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি

তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এইজন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্টসাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারিদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত– কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোকসাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতিকৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়ো; এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ও-দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো, কেহ-বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ-বা আপন উদ্বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোকসাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না- এবং তাহারা যে, কেহ বা কিছু তাহা কাহারও খবরে আসিত না। এখন ও-দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সস্-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে-সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক-একবার আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্তব্য।

ভুলিয়া যাই ও-দেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে- যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহারা যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো- জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি, তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি, তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি, তুমি অন্যায় করিয়ো না- এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও- সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক

মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে- সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব-চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা- সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পার, তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ-কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ-কথা নিশ্চিত সত্য যে, য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে- সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরিব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি- আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি- সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি

আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি এ-কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেইদিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোটো হয়- দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই; তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুইচারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে- অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে- তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই- ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর-কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে

যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে– এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি;– নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার ‘পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির ‘ পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে– সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

১৩২১

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর-বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই- সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে-লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পুণ্যজীবীর ‘পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে- বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্মনি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃষ্টসংঘ বর্তমান য়ুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে- সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যতকিছু অন্যায় করিয়াছে খৃষ্টসংঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এ-দিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব-চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে “অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া”। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরামদাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়াটিতে হাত পড়িবামাত্র তিনি হুংকার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই– রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচম্‌কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে– কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই তো বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিস লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যে-কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্র যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন লইয়া ছিল না– মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয়-প্রভু ও ব্রাহ্মণ-প্রভুতে সর্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত;– বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে আপস করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাজায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিসটা দেনাপাওনার জিনিস; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিসটা ঠিক তার উলটা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পালকির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়– কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল– এই কারণে তখনকার যতকিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

একসময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে-আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই– জমাখরচ সব একজায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে– তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গসগস করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

একসময় ছিল যখন কাড়িয়া কুড়িয়া-লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে- যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন-পণ্ডিত যে-তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে-তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

১৩২১

ছোটো ও বড়ো

যে-সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত; যে-সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে-বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্তমানকালের পশ্চিম মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থুল বাধাইয়া তোলে; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে-দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আরেক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কানমলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলণ্ডে এক সময় ছিল, যখন একদিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যান্ট্ ও রোমানক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমনকি বহুকাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলণ্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে-দেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও

মানসিক কারণগুলি আজ ইংলণ্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন। যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর ‘পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা ভাব রুচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্কচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে; যাহাতে সম্পদে বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ ইংলণ্ডে স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান-ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গলসাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয় পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামতো ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনো কালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত। আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন। অনেকদিন পর্যন্তই আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ-কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই “ডগমা’ অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ

কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন– সাহাবাদে কিম্বা কোনো এক জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে পারিলে না। তোমরাই আবার হোমরুল চাও!” জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, “না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম। আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও।” বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোক, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, “হিন্দুমুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তো ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন। উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল– সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসর্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশুরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।”

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি; সেজন্য উল্‌টিয়া কর্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে-ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে– রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব। আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছায় পাষাণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত?

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার

কিছু নাই; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার নহে; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারিদিকের দাবি ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানাদিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে-পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দেয় নাই, ভদ্র-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বই কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয়ে সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এদিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে-গাভীর বাঁধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুকরা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সব-চেয়ে বড়ো কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই এ-কথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতিহিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে-অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎসংসারটাকে একলা দুহিয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্যোগ ও বড়ো উৎসাহ রাখি বলিয়া শয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙক্ষা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের 'পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না– আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির আওতায় মানুষ বাঁচে না। কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিক্যাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে, মৃত্যুর চেয়ে

দারুণতর, সে-কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাসগুপ্তের মর্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষ্যে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইয়া থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে-লোক স্বার্থপর বেইমান, যে-উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ংকর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কী। তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে যাও কেন। বস্তুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে, “পর্বতো বহ্নিমান্ ধুমাৎ।” গুপ্তচরের যুক্তি বলে, “পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ।” কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই,নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল। দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে। ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র থাকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।

এই-রকম চোরা-উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এ-দেশের ইতিহাসসৃষ্টি-

ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবি আছে বলিয়াই এ দেশ আমার দেশ, এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এ-দেশে ইংরেজরাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাছাড়া নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময় মতো সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্মের দোহাইকে সে দুর্বলতা এবং শৌখিন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে সমস্ত ইংরেজ এ-দেশে রাজসেরেস্তার আমলা বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সবচেয়ে সমুচ্চ,আর ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবি ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যাহারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, কঠিন স্বাজাত্যাভিমানের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের

মানুষ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরী আপিস। এদিকে ইংলণ্ডের যে-ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিক্যাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পক্ককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং “আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি” এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবি করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়ান্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়। ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব।

যে দূরবর্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধস্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায় যে, নিচের আকাশের ধুলানিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে-একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত-দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ

আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায় ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন। যে বড়ো-ইংরেজ ষোলো-আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে সমস্তই কি বাদ পড়িল। এই ছোটোখাটো ছাঁটাছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামী ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সরকারী অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে। কেননা ঐ ওআর্ক-হাউস সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারী বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্যাধ্যক্ষ পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না– সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি

পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড়ো ইংরেজের কাছে আপিসের দফতরে এবং জমাখরচের পাকাখাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি। সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি কত রপ্তানি; কত আয় কত ব্যয়; কত জন্মিল কত মরিল; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিস, শাস্তি দিবার জন্য কত জেলখানা; রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয়তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেণ্ট্ দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ-কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্ তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়- সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ-কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ-কথা বলা চলিবে না যে সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিংবা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিংবা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে এ-কথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ-কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্মী;

য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিত্তকে প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকুলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না-ও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাতলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটায়– কেননা চারিদিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া বর্জন করিতে থাকে। শয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্বল বলিয়া বিদ্রুপ করে। বড়ো-ইংরেজ এ-কথা বুঝিবেই যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আরেক পিঠে আমোদ। যে পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃত কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সব-চেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জানলার বাহিরে রাস্তার ধুলার

উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন এই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ-কথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তাহা স্পর্ধা করে।

অতএব ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অতবেশি কলরব করিতে-করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের “মাইন’ সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তারপরে লোনাজলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো-ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো-ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে শুরু করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন, মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্তীর জোর কতটা এবং ইঁহাদের মেজাজটা কী ধরনের সে কি বারে বারে দেখি নাই। ছোটো-ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বার বার বলি, “কিসের জোরে স্পর্ধা কর? গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনি অহংকার থাক্ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও তো দেখি না। যদি ধর্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ

ভরসা রাখো। স্বেচ্ছাপূর্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোকশ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।”

দেখ নাই কি, বরদানের সংকল্প-ব্যাপারে ভারত-গবর্মেন্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এ-দেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, “ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি। এমন কী উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেন্ট্ হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে?” অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন্ রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইঁহারাই বলেন, “উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুল্লুকের বে-আইনের আমদানি করিতে হইল।” অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচ আছে। কিন্তু তা-ও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে-ইতিহাস ভারবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না; তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নক্শার রেখা ছাড়াইয়া কিছুদূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জাইতে গর্জাইতে বল, পাথর দিয়া বাঁধো উস্‌কো, বাঁধ দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নিচের দিকে তলাইতে থাকে- সেই চোরা-প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের রক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে-কথা বলি। বিনাবিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist

বলিয়াছিল। ইহারা ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন-কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে-দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ-কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে-ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারি হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই "একস্ট্রিমিজ্‌ম্' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে-কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেই জন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, "একস্ট্রিমিজ্‌ম্' গবর্মেন্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো "একস্ট্রিমিজ্‌ম্' কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে "শর্টকাট্' বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। "লে আও, উস্‌কো শির লে আও" এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে-দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত-পরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ

করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে-পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই এ-কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌- বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও এ-কথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমুলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়।- তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্মবুদ্ধিও যে এত-বড়ো পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন

অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এ-দেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল। দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়- এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে-দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিক্যাল ভিক্ষা-বৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিক্যাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না। এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে-কথা মনে রাখিতে হইবে; আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ-কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তারপর পোলিটিক্যাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোরডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ-রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে

বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোটো- ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমতো বুঝিবে কিংবা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকমের দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিমকালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নিচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে-পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের ‘পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া- এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার খেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে- বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।

আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর-বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ন দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গনি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।

যে-অধ্যক্ষের ‘পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা তো রক্তমাংসের মানুষ; তাঁরা তো রাগদ্বেষবিবর্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাসমাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়-কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারিপাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, আর পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত, সেখানে কার্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং

বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হইতেছে এ-কথা কি আমাদের ছোটো-ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জর্মনিও এই বিশ্বাসের জোরে ইন্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্মনিতে আজ বড়ো-জর্মানের চেয়ে ছোটো-জর্মানের প্রভাব বড়ো হইয়াছে, যে-জর্মান কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দামাত্র। আবার বলি, “শির লে আও বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে যে-রাজকার্য উপস্থিতের, কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্মনির প্রতি মহৎ ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরমসত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ঝে ও ট্রীট্‌স্কের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক; আমাদের বর্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারিদিকে সংকীর্ণ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত; বড়ো বড়ো উদ্ধত পদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ ও খর্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ; অথচ সেই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো গুল্মের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে-অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই ভয়দ্বেষ-বিবর্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এ-দেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না।

তবু আমার বিশ্বাস, এই সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না– এমন কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাবসম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু এক-এক-সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ-সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না– কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই সকল লোকের বিদ্রুপহাস্য-কুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চকমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এমনি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে-বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatants বলিবে না।

যদি জিজ্ঞাসা করো এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন-কি চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন এ-কথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তারপরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই- এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তারপরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচরবৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ংকর অর্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিসের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপি চুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে ঝাড়ে ঘোরা- আর-কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিসের সঙ্গ করা- এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে-শাসনকর্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, ভাই কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি সি| আই| ডি-র বাঁকা ইশারামাত্রে চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; তখন অপরপক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ন থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই সব মানুষই যেখানে ষোলোআনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুখনো পার্চমেন্টের নিচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্বত্রই সেই কর্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভূত্বজাল বিস্তার

করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইঁহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি- ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়। তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি;- কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্যন্ত সঙিনের আগায় সিধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী। না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক আর যারই হোক দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলই জটিলতর হইতে থাকে।

বর্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এ-দেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সব-চেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে-আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ-দানে তাঁহারা উপলক্ষ্য, এ-দান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্লপক্ষের দিকে তাঁরা যে-সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আরেক অংশ

দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ-দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উলটাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না; পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, “never the twain shall meet’;এত-বড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে-অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলই তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; আমরাও “স্বধর্ম’ বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের

বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

১

একদিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আরেকদিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি প'ড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ ক'রে বলে ওঠে, বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচি নে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া ক'রে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জানো, পুরাকালে একসময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সঙ্গে। তারপরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথমবয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া শোধে

লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সঙ্গে। অথচ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্ছে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দুনৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পুবদিকের প্রান্তে খোলা জানলার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না-যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি, রেলভাড়া দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে,- মাঝে মাঝে লিখব। মুশকিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হালকা হওয়া উচিত- লেখনীর পক্ষে সেই হালকা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না; কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহংকারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে- বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান বলে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই; লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলেছে, “এইখানেই বাস করো, একটু থামো।” আমি বলেছি, “আমি থামলে চলে কই।” ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্ষু ঘুরতে ঘুরতে চলেছে; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চাকার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নে। “আমি-নইলে-চলে-না’র দেশ থেকে “আমি-নইলে-চলে’র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারাটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানে না। আমি থাকলেও যা আমি গেলেও তা, এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহংকার এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কী করে। তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে। দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিঁকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্ছে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে, এ হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে-দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উলটো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা- অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত-কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহংকার যে-হেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকার, সেইজন্যে এইদিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীন কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগলে। দেখি কেবলই গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অমোঘ অন্ধ অহংকারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে মানুষ বলেছে, অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখছি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল-মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে একে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে

মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতিবড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নিচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিসপত্র বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্! বহু, বহু, বহু, সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক, যোগ করে করেও তবু তো অমৃতে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হল হুংকার আর শব্দকে সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সংগীত; ঐ হুংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারের স্রোত নিজের উলটো দিকে, উৎসর্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্যব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনোই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোভে, যে-শান্তি সংযমে, যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম- আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিমন্ত্রের শক্তিতে, না আনন্দময়ের আনন্দে?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য ব'লে বরণ করি তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন ব'লে মানতেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শান্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ;- বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না; শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়- অতএব ভীরু

ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম ব'লে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে:

অধর্মণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

ঐশ্বর্যগর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না- যে ক্রূর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসুরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স্ এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয়; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কন্ফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্লক্ করছে।

অপরপক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব-গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই একদল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা; বলছি যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ,

দুইয়েরই সুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে- সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না- তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বলতে পারে; যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন,এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত- যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে- শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করি।

২

কারো উঠোন চষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে, যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিসকে ভিতরের করে আপনার করে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিস করে তোলে; ঐখানে সূর্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের খেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে না। যে-সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি, কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে দামী। সদাগরের দোকানঘর জিনিসপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার ক'রে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েছে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পায়। তার ঐশ্বর্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষতে পারে না।

আরেকটা ফাঁকা, যেটা সবচেয়ে দামী, সে হচ্ছে মনের ফাঁকা। যা-কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরিবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে, অশত্থগাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিসটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্ছে শারীরচৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীরচৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায়, দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো-সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হল। আজকের দিনে ভারতবাসীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনই এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর-কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়। পালোয়ান আজ জল স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণহৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনও যদি দেখা যায় এতবড়ো বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তা হলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এইজন্যে যে, য়ুরোপে আজকের যে-শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে সেই শান্তি টেঁকসই হবে কি না সেটা বিচার করতে হলে এই সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ, অস্ত্রাদিপ্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ-পক্ষ “ক্রাইম’ অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ “ক্রাইম’ কখন করে? যখন সে ধর্মের গরজের চেয়ে আর-কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্মনি ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ-পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্মনির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না; হোক-না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই ধর্ম নেই। আর যখন বিজিতপ্রদেশে জর্মনি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জর্মনির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ-পক্ষে বলেছিল, আশু প্রয়োজনসাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব। সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই। সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে।

ধর্মের দিক থেকে এ-সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্তনে কখনোই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশান-বৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন

দুর্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তার মন যখন দুর্বল তখনকার ধর্মবাক্যকে ষোলো আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ-পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হল না, মন বদল হয় নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোন্‌খানে। লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্যেই অতিবড়ো বলিষ্ঠেরও ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানিও লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্তব্য ব'লে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ংকর লোভের দিনে সকলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চতানের ধর্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্রে খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের

মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে। যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট– এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে- ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিঁকতে পারে না।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন:

It does not however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i.e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases bending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombared Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France l l l He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No indeed! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China organised by Japan, threaten us, in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্যে যে নিচে আছে তাকে চিরকালই নিচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্‌-কন্‌ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য-অন্যরাজ্যের মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপসনিষ্পত্তির যোগে শান্তিকামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকাবাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকাখাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে-জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ একদিন ভরাডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেস্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

৩

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়।

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্মল দূরত্বের সংগীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নিচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায়, কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়। সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হল না। সেখানে মনের মধ্যে চির-বিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর

নানা আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনই এইসব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে-প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে; বার বার কত আর মুছব।

রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে। ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে; দাম দিয়ে নয়। যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি-চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হাওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসীলেখক আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে লিখছেন:

In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility ll ll In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙচুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা-পাওয়া এবং লজ্জা-দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়– বলে, ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চলছে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও এ-কাজ করেছি, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ-কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ংকর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নিচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নিচের

দিকের টান ততই ভয়ংকর। যে-মাটি বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্বল। এবং আশ্চর্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্ছে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, এক-একসময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের সুঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করছে তারা আমাদের কলুষের ভার আরো দুর্বহ করে তুলছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা এই সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র; তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর-কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আরেক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র। যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এইসমস্ত অপকর্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার! পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কী রকম ভয়ংকর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এইসব পলিটিক্স-বিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই। তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বে শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ-কথা তাঁরাও ভুললেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা, এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া ঘেঁসে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চলতেই পারে না বলে তারা নিজের ধর্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে ততদিন থেকেই এইসব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেইজন্যে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

আমি পূর্বেই বলেছি, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ংকর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এতরকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্ছি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্তিমান, এবং যেটা অসংগত সেটা তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে; পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে:

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. “I was powerless,” says Mr. Du Chaillu, “to correct its evil nature.”

তাই বলছি, সবলের সব-চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে দুর্বলের কাছে। দুর্বল তার ধর্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায় না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব-চেয়ে বেড়ে উঠছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধা যে, এর জালে যে-বেচারা পড়েছে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড়ো শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে শাসনের ইস্ক্রু-কলে এমনি কষে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা সেই শাসনের ভার নিচ্ছে, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতিসহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখছে না।

এই তো প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এসব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো, কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। একদিকে ভয় আরেকদিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্ব'লে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হলেই সব-চেয়ে বড়ো লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো,

ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি। ও অভিভূত করতে পারে কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি। আজ প্রায় দুহাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে। আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উলটো। এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তারপরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।

লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম– বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন-করে-হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি। যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ-বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন। যখন–

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।

তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে-চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি। য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পুজো করছেন;- মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টক্‌টক করছে; খাঁড়া শাণিত; বলির পশু যুপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন আমরা যিশুকে মানি নে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ, একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আরেক দল পুল্‌পিটে চড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে-মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী। ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো; কিন্তু হল কী। হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা

স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে- মা, মা, মা!

যখন মোগলপাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পূজা আদায় করবই। নইলে? নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়। ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্ট্রিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে-দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট করে। যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা

অমর সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে, মৃত্যুকে দেবতা ব'লে, আপনার চেয়ে বড়ো ব'লে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব-চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব? সে চলবে না; কেননা পুজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিকগে। কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না। মরার বাড়া গাল নেই; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তা হলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

৫

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনোদিনই খায় নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশল ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে। তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তা হলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে, কী মাল কী সওয়ারী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারিদিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হল, কেমন করে হল, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না। তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব। নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না?

আমি পূর্বেও আভাস দিয়েছি এখনও বলছি দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাই নে সেখানে আমাদের ব্যথা পৌঁছয় না; মাটির উপর যে-সব পোকামাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখি এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারি নে। পাখির সম্বন্ধে যে-বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে-বিচার করি নে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্তব্য তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারো পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানেই আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো বলে চিনতে পারি- এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আসুক, তার চোখে সে পড়বেই, কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে

বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবি তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এইজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়েছে। আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সবচেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নিচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি, তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চালচলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তা হলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তারপরে এইসব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানবসভায় স্বভাবতই জোরগলায় সম্মান দাবি করতে না পরে, যখন তারা এত সংকুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম বলে গ্রহণ করব না।

আমরা নিজেরা সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়।

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না! এ-কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব এমন কথা বলি কোন্ মুখে। আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয়? যদি, আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তা হলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না।

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব, ধর্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকো; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার করবার আশা করি নে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো। সমস্ত

বরাতই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়।

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নিচে হিন্দু মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ-কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্মের দাবি নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সংগত কারণ নির্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি,- সে-ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর

করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে এ-কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে-দেশে এই সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত ক'রে রাখে সেখানে তার কোনো দাবি স্বভাবত কারো মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানবস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নিচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ংকর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র একদিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চারদিকে বেড়ে ধরেছে, আর-একদিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে, সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে। তারপরে অন্যদিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। একদিকে মূঢ়তার ভারে অন্যদিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অতিভূত করে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে? তারপরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তা হলে সকল

প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনই জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ-কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেঁচে ফেলা। এ-কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বই মন্দ নয়- কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শক্তিপূজা

“বাতায়নিকের পত্রে’ আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অনুরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ ব’লে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই- সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সবচেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে-সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়করক্রূপে প্রকাশিত হত। তখন চারদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমতো স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ-কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খ্রীস্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখ্রীস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখিতে পাই। আজও তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখ্রীস্টানের প্রতি খ্রীস্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার- এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই “শক্তি’ শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না, কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে- অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক- এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে- সে-সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে- “বাতায়নিকের পত্রে’ আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ-কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।–

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

১৩২৬

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায়; এমনি করে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ-জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এইজন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে-চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারছে না। এই সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখতে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসে– এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে

সে বলে উঠল– আমি অসাধ্য সাধন করব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে। সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারদিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল, তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে– চকমকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যে-হেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরেই এই নখদন্তের পরিবর্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করছে; যা তার চারিদিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই, যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নিচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়, পাথরকে ঘষে-মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে যা সবচেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সবচেয়ে অনুগত করে তুললে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্মই হচ্ছে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ; সে কেবলই উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো এক দল মানুষ যদি বলে, "এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু করতে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে', তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্যজাত সেইখানে তাদের কৌলিন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিনলাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার

থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ-কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্যসাধন করতে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে;- তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন “সাধনা’ কাগজে আমি লিখছিলুম, তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলেম, অধিকার-বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে “আবেদন আর নিবেদনের থালা’। তারপরে যখন আমার হাতে “বঙ্গদর্শন’ এসেছিল তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যেহেতু ইংরেজ সরকারের পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেই দিন এই কথা বলতে হয়েছিল, “এহ বাহ্য’। এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী, উপলক্ষ্য, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশে যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ- তাকে চাই নে বললেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বললে তো কথাই নেই। মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো, বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে

অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা জ্বলবামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন,–

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

অর্থাৎ, ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা, তাকে না-এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমতো তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আরেকটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না-কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলশ বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এইজন্য যে-দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা কর্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের

মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে-দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে বহুকাল পূর্বে “স্বদেশী সমাজ’ নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ ইংরেজ রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা এইজন্যই দেশ আমার প্রিয়- এ-কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ-কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ; প্রথম- ক্রোধ, দ্বিতীয়- লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল,- আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে

একদিন বলেছিলেন, “তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন। কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।” তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল, যে, “উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না।” যাই হোক সেদিন ঠিক যে-সময়ে বাঙালি কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব– হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে ক্ষনধয়দনধ সক্ষভদন ড়তরন, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী, আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে-ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোটকথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্তী কালে এই দ্বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার হাঁ-ই বল আর না-ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সেদিন চারিদিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে- সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এতবড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে একদিকে আছে হৃদয়াবেগ আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে-ক্ষতি সে-ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ-কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও-জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ-কথা খুব জোরের সঙ্গে সে-মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চিৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বান্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা– পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না, মাঝের থেকে পা দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্‌, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ ব'লে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে-যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্যদেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ বলে যে-গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আরেক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকজ্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেছি সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে, তখন

তার ঝড়ঝড় খড়খড় শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি-দড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক স্ক্রু আলগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ-গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে-জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমতো ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো-একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে। এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিস। অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়? যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, এ-কাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে-আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো-একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না; তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে– সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, চিন্তা কোরো না, কর্ম করো, তা হলে যে-মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার, অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, আমরা সমুদ্রপারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী।

অর্থাৎ যে-প্রণালীতে চললে মানুষের মন বলে জিনিসের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে-মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে চলে তার যে-রকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্য আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেই রকম। কেননা পূর্বেই বলেছি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি; এইজন্যে এক চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আরেক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনাশিয়া বলে, যে-মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে অভিমান করে, তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন, উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে-জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা, তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে-দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক্ গ্লাডস্টোন ম্যাট্সীনি গারিবাল্ডির অস্পষ্টমূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে- তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন, তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে-মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি

দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে-নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরি হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়- এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া- ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে-কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ- কোনো না-এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি- প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি- সমুদ্রমরুপারেও যে-দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছে। আজকের দিনের কোনো বণিক কোনো সৈনিক এ-কাজ করতে পারে নি; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ, পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। কেন। কেননা, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক

থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবরদস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেছি- সেদিন গরিবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে; প্রেমের ফল সে একদিনের নয়, অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমাদের দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই বিচার করতে যাই আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখচাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে- সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়,তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো-একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুললে। যে-আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কতক্ষণ। দেখতে পাচ্ছি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেক পক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা। আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের ‘পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্” এটা যে-ভারতের কথা সে-ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুশকিল এই যে, যে-লাভের দাবি করা হচ্ছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়– কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে একদিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তারপরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্ তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে এ-কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না। এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা

ওঝার খোঁজ করি নে। কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজিভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী। প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনো রকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। উদ্বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব।

মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বাহাদুরিতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি-চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে-পাথর চাপা ছিল সেটা যেন

একমুহূর্তে গেল গলে। এর কারণ কী। এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে মানলুম। তারপর আমার দরকার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে-সত্যের দরকার সে আরেক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া করে হঠাৎ বলে বসেন, “বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝংকার দাও; তা হলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজতে থাকবে”, তবে সে-কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ-কথা তাঁর বলাই চাই, “এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।” তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনাপ্রণালী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি হলে বেসুর বাজবে, অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্বক সযত্নে পালন করতে হবে। দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো– এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিস সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে শিখে নিতে বসেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন থাক্‌। কিন্তু স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে। সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্বে তো বারংবার তার পরীক্ষা হয়ে

গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্যে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারে নি বলেই তো এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা করে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন,

> যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্
> এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা- তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই “আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা”। এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক। বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রার ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উলটো পথে গেল। যে-দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে

আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে; তার সেই জয়পতাকা আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন করছে না কি- লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে ছেঁটে দিচ্ছে না কি। আর এইজন্যেই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না। বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে- মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে-পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে সুতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই-বা অল্পকালের জন্যে। যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়। স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি– সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়। যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে, অন্য সকল রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কর্তার আসন পড়বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। এ-কথা মানছি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি, কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেননা, আমার পূর্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে

পারে– যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না। এই যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে। সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়। কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ-সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে;– বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা– অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় বলেই যে তা নয়। হোক বা না হোক, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এ-ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল– এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে-ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে– জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিত বাঁকা হয়, সাঁকো নির্মাণে এমন গলদ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ি চললে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে-খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে সেই খাতা নষ্ট করে এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মনে এ-কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হলে এরা ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ-ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের ‘পরে এসেছে।

সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে– এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে-কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ-কাপড় তাদেরই, ও-কাপড় আমি পোড়াবার কে। যদি তারা বলে পোড়াও তা হলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে-মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে-কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ-লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে-অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে আমরা আর্থিক যে-অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরও কঠিন হয়ে উঠবে না? এ-তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু

সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই– ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী-রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে-কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাহিরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে একমুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল তখন এই কথাটা আর লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়– এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে-চিন্তা করতে হবে তার সে-চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে– যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব করেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মানুষের মধ্যে এই যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘটছে, তার চিত্ত সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্ছে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে- স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই, তাই বলে এ- কথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে, কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্রের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা, তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরি। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্বজনীন যে- সকল প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্রের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে-অবস্থায় তাকে যদি তার অতীত-যুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে-বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই যে লীগ অফ নেশন্‌স্ প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ-বাণী সত্যকে যদি-বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক- কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে

পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি- আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্স্‌কে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে-মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশের এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্য একটা আকাঙক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখেছি যারা এই সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে। সেইসব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই রকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে; যেমন রোম্যাঁ রলাঁ,- তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত। সেই রকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে; সর্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্তিমান। তারা ভাবী যুগের মহিমায় বর্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন “পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং” তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকব? আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না,- য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদা কালো নেই; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের জন্য

তাদের অন্তনিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন; আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন!

১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ-বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালিতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক-এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরি খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেনসিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিসটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে-প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়্গড় করে ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু-হু করে হুংকার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তিভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ যে

সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠল, “ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।”

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তা হলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যতক্ষণ সেটা আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, ঊনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা করে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কী চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ-স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর-সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি। কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়। যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হত, তা হলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু,

সুতরাং যে আমাকে বাঁধে আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে-স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসংবদ্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ করে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলই ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে? যে-মুক্তিতে অহংকার দূর করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য– এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে-কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, য়ুরোপ যখন বলেছে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল– সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের

দুঃখ-অকল্যাণের কারণ- নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ-কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজবউ বলছেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড়োবউয়ের হাত থেকে ঘরকরনা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে-ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা, যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আরেকটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে, আর যারা মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে দয়া করে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর অনুগ্রহের ছিটেফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ মেটে নি। এ-ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানাটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অস্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভেদের দুঃখ থেকে ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ– তাতে বলে, ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড়ো আরেক পা ছোটো, সে আরেক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সব রকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে চালাতে গেলে তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ যে পূর্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বলছে:

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,

এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল– কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহারসমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন– বাপের বাড়ি ছুটে গেলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আরমধ্যমাটি তার ফলভোগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন– নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আরেকজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্ছে, যে-কারণে এমনটা ঘটে, আর যে-কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া;– আবদার করে বললেই হবে না যে, মেজবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুশকিলের ব্যাপারে এই যে পিলের উপরেই

আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী ব'লেই ফেলো। বলতে সংকোচ হচ্ছে; কারণ কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তার বাবু অনিদ্রা না ব'লে যদি ইন্‌সম্‌নিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি- ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে-ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়; যার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে, অন্য দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের 'পরে নিজের ভুল যোগ ক'রে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি

সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীব-লীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রুপটি হয়তো ব'লে থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক্, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বনেশে; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই ক'রে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে-মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্ল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! শুনে ভাবতুম, যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল, "ভয় কী, দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ো' তখন সে সান্ত্বনা পায় নি; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজর্লাণ্ডের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সান্ত্বনাটা কী– ফলের বেলায় দেখি, আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উলটোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজর্ল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্ত-কলেবর

হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত ব'লে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন। সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্‌কী। "বেনিয়াকী লড়্‌কী' হিন্দু আর যে-ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে-দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমতো চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনলে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ ব'লে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ

আমাদের নয়, দোষ তারই; ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্বিরোধেই ছিলুম কিন্তু, ইত্যাদি ইত্যাদি।– শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে সর্বনাশের পালা আরম্ভ করে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্ছে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে-জাহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাপ্তেন যদি বলে, যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্, তা হলে ঐ কাপ্তেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয় পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয় তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি। তারা ভয়ংকর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করছি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন, কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ ক’রে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড়ো আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়ছি, যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন, সে-দিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই। আমি বলি, এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্যত্র বলেছি, ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্মশব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচি নে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্যপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে-মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই ব'লে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে; পৃথিবী ধর্মের মতো ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভালো, তার নড়চড় হতে থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে; সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে তুলি তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোনো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্যে বিধান নেবার পূর্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে "মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী

করো’ তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে “মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না’ তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, কেন করব না। এ-কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এসব কথা স্বাধীনবিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ- যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে-ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যমিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব’লে ভূতের কোনো জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এতবড়ো জোর তার কিসের। না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে সে বাস্তবের নিয়মে সংযত; যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারি ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে, গা ছম্‌ছম্‌ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে “কেন’ জবাব দিতে পারি নে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, ঐ যে! তার পরেও যদি বলে “কই যে’ তাকে নাস্তিক বলে তাড়া করে যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি- ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে “কেন’ তা হলে উত্তরে বলি, আর যেখানেই কেন খাটাও এখানে কেন খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও- মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে-ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই বলেছি, ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটুক্তি করে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষ-পেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে এতবড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে

আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানি নে। চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয় জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটাকাটা যেসব অতি-ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আর-একটা বোঝা তাদের অধিকার ক'রে বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন- স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, য একঃ অবর্ণঃ- যিনি এক, যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। বুদ্ধ্যা শুভয়া, শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন, অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝাপড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড়ো কাজ। আমরা বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক- বিজ্ঞানে যাকে variation বলে- আচমকা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন,অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগন্তুকটি চার দিকের সঙ্গে সুসংগত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে রুচিকে চারিত্রকে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে পীড়িত অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক, একদা এক ফকির বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদগতি হয়ে গেল। উচিত ছিল, এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে। অবুদ্ধি করে না, কেননা তার কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা; বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেছে তার

সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা– যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধ'রে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তিগদ্‌গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদূর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিকসপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোকচলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, আহা একেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপ্‌ড়াতে চায় না। সেই সঙ্গে এও বলে, আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাই নে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্মের বেড়াজালে এইরকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে; কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে। বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে আর ঘুম হয় না। যেহেতু গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন ক'রে বলেন, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়; তোমরা চুপ ক'রে থাকো-না; কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মতো ডানপিটে ছেলের তো অভাব নেই। শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে

সংস্কারটাকে তো ছেঁকে ফেলতে পারি নে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ তিন তোলার বেশি রজত খরচ ক'রে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সবচেয়ে প্রদান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হল বড়ো কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা তো উপলক্ষ্য। আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হল বড়ো কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল; কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান হাত বাঁধা রেখে আসেন তার কী অনির্বচনীয় মাধুর্য! আধুনিক বলে, সেখানে ডান হাত উৎসর্গ করা সার্থক যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য- কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার কুশ্রী কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে সুন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে- আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশ্‌ম্যান-জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে, পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে-মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ্‌ম্যানের

তা হতে পারে নি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে-জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে-জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুৎ ক'রে গেঁথে রেখেছে, এত ক'রে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পরে চিরকালই পর হয়ে থাক্, হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে, এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উলটো। ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর ব'লে জানে; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে-বের-করা শ্লোক কী বলে সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোক-ব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধ'রে ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ ক'রে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ ক'রে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে ক'রে এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে– আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের ব'লে ঠেকিয়ে

রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ ব'লে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল– সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতিন এই দুই পোলিটিকাল তররঁ-দের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মায় ঝড়ের সময়ে দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে পাখা ঝট্‌পট্‌ করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে। বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা ক'রে ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম ক'রে তোলা গেল, সে একদিন দেখতে পায় তাতে ক'রে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মমত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কী ক'রে। অত্যন্ত দুর্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশরকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর ক'রে সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ানবাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মাহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষনিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালোরকম রফা করবার জন্যে আপনিই

আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরনার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপোষের কন্‌ফারেন্স বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুস্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কিরকম অত্যন্ত সরল ক'রে এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপলাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেসমঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুৎ ক'রে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বারবারই ব'লে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা ক'রে দক্ষিণের হিন্দুসমাজগুরু শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন; তাতে বলেছেন:

The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.

ডাক্তার মুঞ্জের এ কথাটির মানে হচ্ছে যে, হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করে নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে ব'লেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আর-একটা অংশে তিনি বলছেন, আট শো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমন কি হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত। এর প্রধান কারণ, ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্রযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন; তাই মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যরক্ষার ভার সেই সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মানত, মনুকে মানত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এই জন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস-মাত্র প'রে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দুসিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু

এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে– সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য। এরা এক-একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক দুপ্‌প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে– সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকারশব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য ব'লে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে– কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে: য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

১৩৩০

সমাধান

সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড়ো যোগ্যতা।

আমি জানি, কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে “জ্বর’ অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন, সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলত পারতেন যে, তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না; আমি তো তবু যা হয় একটা-কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে। আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর; অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন– শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষা-দীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই; অতএব সকলকেই চরকায় সুতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা, তারপরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা, এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে- এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে-আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দুশো-বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, সেখানে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে বহু লোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালোরকম ক'রে চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অন্নের চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় অহরহ ছুটোছুটি ক'রে মরছে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না

যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তিসাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে। তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব'লে বিশ্বাস করে, তাঁর বাণীকে দৈববাণী ব'লে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে কোনো-এক সময়ে কোনো-একটা কাজ তারা মরীয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনো অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন ক'রে নিতে পারে। কিন্তু কচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে-শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাকে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনেজর দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর

যে, সে পথের সামনে বসে বসে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায়-চিন্তায় আধ-বোজা চোখে সর্বদা নিযুক্ত; তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বললে, তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি ক'রে দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা ছটে গেল। এই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামতো সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে-বুদ্ধি যে-অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই তাকে অলৌকিক-শক্তি-পথের আভাস দেবামাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগাতাবিজ বিক্রি হবে কেন। যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসংগত উপায়ের 'পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগাতাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্রমন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কথা ভুলে যায় যে, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগতাপ-বিপদ-আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারো কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শতধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে-দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে-কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে, সে-দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ ক'রে দৌড় মেরেছে। আর যে-দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ ব'লে চোখ বুজে ঠিক ক'রে বসে থাকে সে-দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজচ্যুতির কদর্য লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্ছে এই যে, দেশের এক দল লোক তো বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণবিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির 'পরে, বিশ্ববিধির 'পরে

বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে। তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না।

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিমুক্তির জোর বড়ো বেশি দেখতে পাই নে; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ংকর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে-সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের ‘পরে আস্থাবান নয়, যে-সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে-সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এইজন্যে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক ক’রে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ব-বশত যে-কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় ক’রে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত ব’লে ঠেকে যে এ’কে আমাদের সমস্যার সমাধান ব’লে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির ‘পরে বিশ্বাস; বাস্তবের ‘পরে নয়, নিজের শক্তির ‘পরে নয়।

১৩৩০

শূদ্রধর্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমতো নানা কাজ ক'রে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তার কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হবে না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তার সমস্ত সংকীর্ণতা সমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্বাচন সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে-মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুশকিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে-স্থলে তার পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তার খেতাব নিয়ে মানের দাবি করে। ফরাস এ দিকে খেটে খেটে হয়রান হয় আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষ তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হত তা হলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবি করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্বাহকে ধর্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকানির্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে, তবে এক দিনও সমাজ টেঁকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম ব'লে স্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয় নি, যে, চাষ-করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, এ কথা সুস্পষ্ট।

যে-দেশে জীবিকা-অর্জনকে ধর্মকর্মের সামিল করে দেখে না, সে-দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সংকীর্ণতাবশত সে-রকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ-রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে-সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়নপ্রথা এক সময়ে আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল- তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়তজাগরূক চিৎশক্তির দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখবার নয়, সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা, কোথায় যে সে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ব'লে পরিচিত,

জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এ দিকে শাস্ত্রে বলছেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ-কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ-কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে-অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্‌ আর নাই থাক্‌, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটে ঘটুক, তার ক্ষতি হয় হোক। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহংকার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তার চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ, যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়– বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিঁকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের-নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া

যাবে। লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্মরক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়, তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে- তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির যে-ছবি দেখতে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশবিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না; কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহুদূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে- সেই চীনের বুকে যে-চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে, য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। সে বলবে, স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না- ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে যে-বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায় যে-পর তার শত্রু নয়; কাজ সিদ্ধ হবামাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই

যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে, I miss my best servant।

১৩৩২

বৃহত্তর ভারত

বৃহত্তর ভারত পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সম্বর্ধনা উপলক্ষে

যবদ্বীপ যাবার পূর্বাহ্নে যে-অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চার দিকের দাবির দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবির আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবি সত্য হয়, অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারি নে সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কালে ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত করে রাখে ব'লে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো ক'রে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌঁছয় না, এবং অতি ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হতে হয়। নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। নিজের পরিচয়কে সংকীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্ম-তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ বা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল, যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

তার পর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের

বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন ব'লে জানি তা হলে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস প'ড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো ক'রে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে বসে বসে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলতে পারি নে।

যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডির মধ্যেও তার প্রতিমুহূর্ত-গত কাজ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে ক'রে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ, অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা

আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশ্যনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানবসভ্যতার সৃষ্টিকার্যে তার স্থান হল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম; সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্যসঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটরকোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে-বাণী আমরা পাই সে-বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা- সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।

অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়,

এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য! আমরা যে-ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানা কারণে সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিরন্তর তারই ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উপেক্ষা করবার তর্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন ব'লে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই; এখানে আমাদের কারো কারো কল্পনা বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, কারো সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌, কারো বা সোস্যালিজ্‌ম্‌এর গোলোকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই- আমাদের দুর্ভাগ্যতাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে খতধন ভশ উয়ক্ষষসন-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিভূতিবিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্বেই বলেছি, নিজের

ব্যক্তিস্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্স্-ইকনমিক্স্এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে, এ কথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশকুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য ক'রে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন ক'রে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি, এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়– এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখস্বীকার ক'রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে-সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায় নি ব'লে আমরা এ'কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এ'কে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে-বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কুল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেইসময় ধারাবাহিকভাবে সাধুসাধকদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন, যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য ব'লে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ, তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক ক'রে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছে, বিদেশী-ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃতকীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন। কিন্তু আজও ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই-সকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে; সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তা হলে তারই জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্‌বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টিশক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করে নি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি-মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে, তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন-সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশভূষা-ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি করবার সুপ্ত শক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে– সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি। এই-সকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরও তো অনেক দ্বীপ আছে, সেখানে আমরা “বরবুদর’ দেখি নে কেন, সে-সব জায়গায় “আঙ্করবট’ এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন। সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায় নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে।

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা ব’লে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মালমসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি ক’রে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্। অহংকার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক ক’রে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলংকার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

১৩৩৪

হিন্দুমুসলমান

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশরঙ্গভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ ব'লে অবজ্ঞা করে না। এইজন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগি ক'রে প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে- আমাদের মর্মের মধ্যে যে-ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা প'ড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি- সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে কম মানুষ হয়েছি- আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্‌মিল্ করছে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন: মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ। অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি

আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাস্টারি শুরু হয় নি- আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল-হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, আর ছোটো ছোটো চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মতো চার দিকে খিল্‌খিল্‌ করছে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে- তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মত্তদাদুরী। এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন; তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি-

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে-

ঠিক এমনসময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে- শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র- সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান-ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। “য়ুরোপীয় বৌদ্ধ’ বা “য়ুরোপীয় মুসলমান’ শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। “মুসলমান বৌদ্ধ’ বা “মুসলমান খৃস্টান’ শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়- অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের শষশ-ৎভষরনশঢ় শষশ-দষ-ষসনক্ষতঢ়ভষশ। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার ক’রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি ব’লে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়,

ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে "হিন্দু'-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ- এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা ক'রে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে দুষ্প্রবেশ্য ক'রে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ ক'রে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল- এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকলপ্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে-অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে- ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে- তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও

মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি

৭ই আষাঢ়, ১৩২৯

নারী

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নবসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই-পেটাই করা মিস্ত্রির কাজে। সেটা আধখানা শেষ হতে না-হতেই প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল ক'রে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়-বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তন নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত– তা প্রয়োজন-অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্যে নিহিত।

প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই

গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত ক'রে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন ক'রে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম কেবলই দেহপরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্যপরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটিসংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রবলবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো– আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর-এক কালে, উলটিয়ে গেল তার ইতিহাস, করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্যে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার, তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি

নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই- তাতে বারো আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে জননীরূপে মেয়েদের যে-কাজ সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসংগত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালী করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে-মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে-সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ-ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অনুর্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখির ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী করে মানুষ গর্ব অনুভব করে; তার সৌন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির, এ-কথা সম্পত্তিলোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ

করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই, তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে-সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না– তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পালকির যুগ। মানী ঘরে সেই পালকির উপরে পড়ত ঘেরাটোপ। বেথুন স্কুলে যে-মেয়েরা সর্বপ্রথম ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে- এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে-মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যেরকম ক'রে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় ক'রে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে-মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছশাসনের সুযোগ রচনা করে; মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল

অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ ক'রে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাট্‌না-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য-বাজারদরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো আনা খাটছে না। যে-বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা-যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনিই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ ক'রে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে-অরণ্য ছিল বিস্তৃত সেই অরণ্য বহুলক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্যতেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই-সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে; তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক

দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে– প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়– যে-ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে-মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি কেবল ঘরের লোককে নয় সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে– তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে; রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ করে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত ক'রে এ সভ্যতা বধ করে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতার পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন

বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে– এমন কি, না আসাতেও পারে– কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে।

১৩৪৩

কর্মযজ্ঞ

হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম-উৎসব করতে হয়; কিন্তু, মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না– তার জন্মের পূর্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয় নি– আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে-সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে– কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই তো সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন– তার কারণ এ নয় যে, আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেছে– তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করি নে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কী পরিমাণে কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তার পরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কিরকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু সবচেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকারগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই

পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে- না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনোমতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখছি- হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাসে পাচ্ছে, দুঃখদুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড়ো ক্ষীণ। যে-সব জিনিস নির্জীব তাকে এক মুহূর্তেই ফরমায়েশ-মতো ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরমদুর্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে- সে তো অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারই মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, ক'জন লোকেরই বা এতে উৎসাহ- এসব কথা বলবার কথা নয়। কেননা, বাইরের আয়োজন ছোটো, অন্তরের আশা বড়ো। আমরা কতবার এরকম সভাসমিতির আয়োজন করেছি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েছি- এ কথাও আলোচ্য নয়; ফিরে ফিরে যে এরকম চেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারও মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেছে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনোই সত্য নয়; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে, কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেছেন সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তা তো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তা হলে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বেহিসাবি আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্ছে শক্তি- নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করি না ব'লেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারছেন না। তাঁর কাছে খাজনা নিয়ে এসো; বলো, হুকুম করো তুমি, প্রাণ দেব তোমার

কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব। আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বাইরের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে বড়ো করে দেখো না, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখো। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, আপনাকে বিচিত্ররূপে উদঘাটিত করে সার্থক করে তুলেছেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েছেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটোমাত্র ছোটো চোখ দিয়ে লোকলোকান্তরে-উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণধারাকে গ্রহণ করতে পারছি, তেমনি আপন খণ্ড শক্তিকে উন্মীলিত করবামাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে সেই শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতার মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না– এর জন্য নালিশ করব না। এই বারম্বার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। তাই মনে কেবল আলোচনা করছি, অন্য দেশ এইরকম করে অমুক বাণিজ্য করে; এইরকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে; অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি– আমাদের তা নেই– এই জন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের

প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি; মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব। কিন্তু জানি না, আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিসগুলো তুলে এনে কী ভয়ংকর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে- তখন তার ভার বইবে কে। বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখি নি- কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলতে পারি নি। কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি, সেইজন্যে এ দেশে যে জিনিসটা গোড়াতেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করি নে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে যাদুকরের গাছের মতো মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড়ো আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে, সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হয়, তা হলে এক রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক, তিন রাত্রের মধ্যে সে সমুলেন বিনশ্যতি। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্বে এবং কাঠ-খড় জোগাড়ের গোড়াতেই, এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্ধকে ধর্মের আশ্রয় দান করেছেন তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা কিছু বড়ো ও সার্থক তার যে কত ছোটো জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানি নে- অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে- সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার 'পরে জন্মগ্রহণ করেছে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি; বলছি– তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেছে যে মানুষের উন্নতিসাধন ভালোবেসে নয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র পুড়িয়ে-পিটিয়ে কেটে-ছেঁটে জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মত দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদগীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি– আমরা সয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন– বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের, বহুযুগের; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো! কে করবে। দেশের যৌবন– যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরায় ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এইজন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ। চারি দিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন

একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তখনই ব্যক্তিত্ব। সংকীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে। দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে ড়নশঢ়ভলনশঢ়তরভড়ল সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে-সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যুষে, যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায় নি, তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে– ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন, তেমনি সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন– ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করছে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন জীর্ণ কন্থার উপরে– আমাদের তিনি ভার দিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেছেন, অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার

অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ– নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন। সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

ফাল্গুন, ১৩২১

চরকা

চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার ‘পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না ব’লেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এতে আমার ব্যথা দূর হল, তা ছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ, সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বন্যদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাবনিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সির মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো একটার ‘পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত তখন সেজন্যে কারো কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সি ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু, যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সিই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে। এ দিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, ওরে পালোয়ান, কুল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা– কোনোটা উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে।

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষ-ফল-লুব্ধ শাসনকর্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এককলের মজুর, এক উর্দিপরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায় নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তা হলে সেই "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের 'পরেই এক-একটি বিশেষ কাজের বরাত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরির বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম। এইরকমে পিঁপড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, এতে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরি করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্মজন্মান্তরের পুনরাবর্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম ও কর্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান শুধু এইটুকু নয়, এমনি করে যারা কল বনে গেল তারা বীর্য হারালো, কোনো আপদকে ঠেকোবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধরে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে,

প্রবল তাদের কানমলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবন্মৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন-না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘুর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন ব'লে অত্যন্ত ছটফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা করে তবে কর্তারা এক দলের কাছে কেবলই আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আর-এক দলের কাছে কেবলই ঘানির তেল; এক দল কেবলই জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাশের হাঁড়ি, আর-এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। তার পরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড়ো কাজে তাদের মন পেতে তারা বলে বসে, মন? সেটা আবার কোন্ আপদ! হুকুম করো-না কেন। মন্ত্র আওড়াও।

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি করে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এদিকে ওদিকে তার গোটাকতক ডালপালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম করে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মতো মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তা হলে কেউ যেন উদ্‌বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এইজন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন; কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে-মাছটা ফস্‌কে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা

করি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবি বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেন নি যে, আগে বাহ্যিক তার পরে আন্তরিক, আগে অন্নবস্ত্র তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড়ো দাবি করে তাকে বড়ো সম্মান দিয়েছিলেন; আর সেই বড়ো সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ; অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি– তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে, তা হলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড়পদার্থ হলে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্তি বদল করা যেত; কিন্তু মানুষের মূর্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই– হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দুরাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাট্‌কেলের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর

অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই; কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, মোগল-পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও তো ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মতো জল ধরে রাখা যায়। এদিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সবচেয়ে বড়ো দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তা হলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলাদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে; কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত-চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই তা হলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরানির কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরানিগিরির দেশে সকলেই জানে। সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই, যে সব কাজ মুখ্যত কোনো একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার

পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় ধভফশভড় ষপ রতথষয়ক্ষ প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় ভশধভফশভড় ষপ রতথষয়ক্ষ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরি করে তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ- অর্থাৎ না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধানতর অর্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার ধভফশভড়, এমন কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড়ো সভ্যতাই হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিকসাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতবড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে-বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই; মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ, অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্মভার যতটাই সে না চাপাতে

পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণই মানুষকে জড় ক’রে শূদ্র ক’রে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই সব মানুষকে মুখে ধভফশভঢ় দিয়ে কেউ কখনোই ধভফশভঢ় দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই। বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে, তখন যে-চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ কোরো না, এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো, এ কথাও তো বলা

হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়। স্বরাজসাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট, আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না। বস্তুত সে কি এতই মস্ত। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্যনির্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে- চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে। একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু, তাও কি সম্ভব হয়েছে। পূজাবিধিই কি এক হল না দেবতাই হল একটি। দেবতাকে আর দেবার্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসছে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধনমন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে। মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের 'পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী বলে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকলরকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সবচেয়ে সহজ দেবতার কাছে সবচেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সবচেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড়ো দাবি করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়ো।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড়ো হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাকবে।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনো দিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে– সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এইজন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সবচেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে– মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়– যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য– তা হলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি! তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এপর্যন্ত এমনিই চলছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারি হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। কনতফয়ন ষপ গতঢ়ভষশড়-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য- মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A.E.-রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়– অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি– এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বই কি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে

পারে। অর্থাৎ, তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু, দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক মিশে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু- ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে- দেশের যে-কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি

তেত্রিশকোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্যদূর বা স্বরাজলাভ বললে যতখানি বোঝায় তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ্য ততদূর পর্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কী। চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন চাষীর এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাও-না কেন। মনে আছে, এইজাতীয় আর-একটা কথা পূর্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি তা হলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরো অনেক জিনিস আছে যাকে আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন-না; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনোটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্যদোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ লাভের যে একটা বিশেষ উদ্‌যোগ চলছে, দেশসুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারো তো মনেও হয় না। তার কি কোনো কারণ নেই। এ-সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার করে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে

মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে- এ-সব কথাই সত্য ব'লে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেইজন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটোকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এইজন্যেই জলের শুচিতা রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্মের সঙ্গে আচারধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্বলতার আর-একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর-একদিন আর-কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়তো স্বারাজ্য-সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয় সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণাসভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশি দিন চলে তবে আমাদের দুর্ভাগা দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেন- পাত উপলক্ষ্যে মানুষের রক্তপাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তা হলে সেদিন ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে, এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি, সেই অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন, তুমি যে-সমবায়জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দুসমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা

করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না; ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এইজন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহত প্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই- এই সাবধানতার মূলে প্যাস্ট্যর-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতোই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মতো প্রকাণ্ড সেইজন্যেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচছে, মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বসুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতোই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে-অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে। তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক; তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক- এই আমার কামনা। যে-কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক ব'লেই জানি- সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু, সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে। ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার

বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বারবার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন; আচার্য রায়মশায়ও জনাদরনিরপেক্ষ মত-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতাসভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর, যাঁরা আমার দেশের লোক, যাঁদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদিবা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কারও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

ভাদ্র, ১৩৩২

নবযুগ

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহতের দিকে মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য, সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে-যত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে, ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু “না’-এর সমষ্টি; কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে “না’ নয়, “হাঁ’। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল; ভারতবর্ষ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেছি, একসময় যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্ব-ভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়, সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে-ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল। কিন্তু, যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবা মাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্‌গীতায় আমরা এই নূতনের অভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা

হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিয়া সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়; কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে।

আমি একসময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ন হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে। যদি কারো মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ করে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমনসময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন। এর থেকে মনে হয়, যে-অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে, তবে বাঁচব কী করে। রাউণ্ড টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে-ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না।

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থির-প্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন।

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনও তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যতি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে-সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এতবড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে-মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ, ১৩৩৯

প্রচলিত দণ্ডনীতি

আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক্, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এইরকম পোলিটিকাল দশা পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় বলে আমি মনে করি নে।

দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে কিছু যদি বলতে হয় তবে আমি বলব, প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।

মনে আছে, ছেলেবেলায় পুলিসকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা-বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেইরকম। তাই তখন মনে করতুম, চোরও বুঝি মানুষজাতির স্বভাবগণ্ডির অত্যন্ত বাইরেকার বিকৃতি। এমন সময়ে চোরকে স্বচক্ষে দেখলুম, আমাদেরই বাড়ি থেকে অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে দরোয়ানদের লক্ষ্য এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন কি তার চেয়ে দুর্বল।

আমার সেদিনকার চমক আজও ভাঙবার সময় আসে নি। যারা যে কারণেই হোক আইন ভেঙে অপরাধীর শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে মন বাধা পায় না। ধরে রেখেছি, তারা আমাদের মতো নয়; আর যারা আমাদের মতো নয় তাদের প্রতি আচরণ অত্যাচার

হয়ে উঠলে সমস্ত সমাজেরই যেন সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের গূঢ় অন্তরে যে নির্দয় প্রবৃত্তি আছে তাই চরিতার্থ করবার উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে এরা।

আমার আর-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, এ ঘটেছিল পরের বয়সে। একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিস একজন আসামীকে– সে অপরাধ করে থাকতেও পারে, নাও পারে– কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তুর মতো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এটা এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ, এ রকম কুদৃশ্য আমি ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের আর-কোথাও দেখি নি। এর মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল– এক হচ্ছে মানুষের প্রতি অপমান; আর-এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান– এক হচ্ছে আইনভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা; আর-এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং সেই অবজ্ঞার ভাগী আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে।

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী, এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসংগত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি নির্দয়তায় সে রস পায়। সভ্য দেশে সেই রসসম্ভোগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কারণ, কালক্রমে মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে, সেই খানিকটা-সভ্য মানুষ আপনার ভিতরকার বর্বর মানুষকে লজ্জা দেয় এবং সংযত করে। যেখানে সেই সংযমের দাবি নেই সেখানে বর্বর সম্পূর্ণ ছাড়া পায়, নির্দয়তাই বৈধ হয়ে ওঠে। জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি অতিক্রম ক'রে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানা আশ্রয় করে না থাকত, তা হলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের যে-কোনো

জায়গাতেই ছোটো বড়ো যে কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে তলে সে আপন সীমা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপে। সেখানে সভ্যনামধারী বড়ো বড়ো দেশে শাস্তিদানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভ্যতাকে যেরকম বিদ্রূপ করতে উদ্যত হয়েছে, তার মূল রয়েছে সকল দেশের সব জেলখানাতেই। অনেক কাল থেকে অনেক খরচ করে সয়তানকে মানুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্যে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এইসব জেলখানায়।

এইসব শাসনকেন্দ্র আপন আশেপাশে মনুষ্যত্বের কিরকম বিকৃতি ঘটাতে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত অনেক দিন পরে আমি আজও ভুলতে পারি নি। চীনযাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌঁছল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একজন চীনা ফেরিওয়ালা জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টায় তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কর্তব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম, আমাদের স্বদেশীয় শিখ কন্‌স্‌টেবল তার বেণী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। রূঢ়তা করার দ্বারা ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংস্কৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অবারিত করবার সুযোগ দেয়।

মনে মনে কল্পনা করলুম, একজন য়ুরোপীয়– সে ফেরিওয়ালা নয়, হয়তো সে চোর, সে প্রতারক, সে দুর্বৃত্ত– তাকে ঐ শিখ কনস্‌টেবল গ্রেফ্‌তার করত, কর্তব্যের অনুরোধে মাথায় এক ঘা লাঠিও বসাতে পারত, কিন্তু তাকে কানে ধরে লাথি মারতে পারত না। ঐ কনস্‌টেবল নিষেধ করেছিল ফেরিওয়ালাকে, লাথি মেরেছিল সমস্ত জাতকে। অবজ্ঞাভাজন জাতির মানুষ কেবল যে অপমান ভোগ করে তা নয়, সহজেই তার সম্বন্ধে দণ্ডের কঠোরতা প্রবল হয়ে ওঠে। হয় যে তার কারণ মানুষের গূঢ় দুষ্প্রবৃত্তি এইসকল ক্ষেত্রে বর্বরতার রসসম্ভোগের সুযোগ পায়।

বেণী ধরে টেনে লাথি মারতে যারা অকুণ্ঠিত সেই-শ্রেণীয় রাজানুচর এ দেশে নিঃসন্দেহ অনেক আছে। যে কারণে চীনে তাদের দেখেছি সেই কারণ এখানেও প্রবল। সেই অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এ দেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, এ কথা আমরা অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের কথা আমি বলব। তখন শিলাইদহে ছিলুম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোরকম করেই জানতুম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন পাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারত; এই হিসাবে চাষীদের চেয়েও জেলেরা অসহায়। একবার জলকরের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত। অন্যায় সহ্য করে যাওয়াই যার পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সইতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পরে রাত্রি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোটে লোক এল; বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিস লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনি একটি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলুম। সরকারি কাজে বাধা দেবার জন্যে নয়, কেবল উপস্থিত থাকবার জন্যে। তার অন্য শক্তি নেই, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের আদর্শ আছে। উপস্থিতি দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

আমাদের দেশের কারাবাসীদের সম্বন্ধেও তার বেশি আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা জানাতে পারি কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা ভদ্র নয়, মানবধর্মের দোহাই দিতে পারি। কিন্তু জানাব কাকে, দোহাই দেব কার সামনে দাঁড়িয়ে। জানাতে হবে তাদেরই যারা বেণী ধরে টান দেবার দলে, যারা মধ্যবর্তী, যারা বিদেশী রাজ্যশাসনের আধারে স্বদেশীর প্রতি অসম্মান ভরে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির ‘পরে আমাদের দাবি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে সরাসরি কাজির বিচার প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর, পক্ষপাতের উপর যে-বিচার-প্রণালীর ভিত্তি ছিল তাকে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এ কথা আজ আমাদের কাছে সহজ হয়েছে যে, অপরাধের অপবাদ-আরোপের পর থেকেই কোনো অভিযুক্তের প্রতি অন্যায় করা সহজ ছিল যে-যুগে সে-যুগে দণ্ডনীতি সভ্য আদর্শের ছিল না; মানুষের স্বাধীনতার অধিকার তখন অনিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। সভ্যদেশে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্য প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের ‘পরে যদি আস্থা না রাখি তা হলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বিশেষে সকল মানুষের ‘পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখছি। এও জানি, এত সাবধান হয়েও অনেক ঘটনায় অপরাধের শেষ মীমাংসা হয় নি। বহু নির্দোষী দণ্ডভোগ করেছে।

তবু যদি স্থির হয় যে, বিশেষ স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোপনে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আন্দাজে বিচার ও আশু শাস্তিদান অনিবার্য, তবে তা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে এমন স্থলে শাস্তির পরিমাণ দুঃসহ না হওয়াই উচিত, এমন হওয়া চাই যাতে বিচারের ভুলে নিরপরাধের প্রতি শাস্তি অতি কঠোর হয়ে অনুতাপের কারণ না ঘটে। কেবলমাত্র বন্দীদশাই তো কম দুঃখকর নয়, তার উপরে শাসনের ঝালমসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলাকে তো কোনোমতেই সভ্যনীতি বলতে পারি নে। ঝালমসলা যে কটুজাতীয়, বাহির থেকে তার আন্দাজ করতে পারি মাত্র। যখন বৈধ উপায়ে নিঃসন্দেহে দোষ-প্রমাণ-চেষ্টার অসুবিধা আছে বলে মনে করা হয়, অন্তত তখন এই সংশয়ের ক্ষেত্রে করুণার স্থান রাখা চাই।

কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যক্ষ্মারোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা-ভোগের নিশ্চিত যোগ্য- এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি।

বহুদিনসঞ্চিত একটা দুঃখের কথা কি আজ বলব। অল্প কালের মধ্যে দেশে অনেক বড়ো বড়ো মারকাট খুনোখুনি হয়ে গেছে। যাঁরা চক্ষে দেখেছেন, আত্মীয়স্বজনসহ তাঁরা অসহ্য দুঃখ পেয়েছেন। যাঁরা ভিতরের কথা জানেন তাঁদের যোগে যে-সব জনশ্রুতি দেশে রাষ্ট্র হয়েছে, দেশের লোক তাকে বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছেন। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ এই নির্দয় ব্যাপারকে পোলিটিকাল অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করেন নি বলে অনুমানকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিনা জবাবদিহিতে কারো কোনো দণ্ডবিধান করেন নি। অপর ক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং দেশের প্রতিনিধিরা একে ন্যায্য বলে সমর্থনও করেন। পলিটিক্সে খুনজখম লুঠপাটের জন্যে যারা দায়ি তারা ঘৃণ্য, অপর ক্ষেত্রেও যারা দায়ি তারা কম ঘৃণ্য নয়। এক ক্ষেত্রে গোপন সন্ধানে তাদের আবিষ্কার করা সহজ, অপর ক্ষেত্রে সহজ নয়, এমন অদ্ভুত কথা বলা চলে না। উভয় ব্যাপারেই শাসনের প্রয়োজন আছে। হয়তো গুপ্ত পাপচক্রান্তের বিধিনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়- তবুও পাপের হেয়তা ও পরিমাণ কোনো পক্ষেই কম নয়।

পূর্বেই বলেছি, দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে; কিন্তু সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনোপ্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।

শ্রাবণ, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে-জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কিরকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে

বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে– কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে অংশত হয় তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশি কোনটার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেই ভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষ্যে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হল। রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি কী বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারই অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হ'ত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টান-ধর্ম-প্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র; অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই, অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগাবোলানো অক্ষরের মতো, মূলের

চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে-অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি ব'লেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদঘর্ম চেষ্টা করি– এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

"সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ,

পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হ’ ত।

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে-সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য পেতেন- সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই ‘পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এইরকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই।

কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারো নেই। দেশের ‘পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি “স্বদেশী সমাজ’ নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল– লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না– কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে– তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে; জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা

দেবার কিছু রইল না; রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকারবাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধন লাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত– বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বই কমে না। স্বদেশী সমাজে তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না ক'রে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে স্বদেশী সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা, এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে-আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন; সে কি এই চরকা-চালনা। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট

করে রাখি নি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে একমাত্র ক'রে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে। স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে- কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মত পণ্য উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সেদিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে-কাজ নিজে করতে পারি সে-কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই

প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে আগে ফাউন্টেন পেন পাব, তার পরে মহাকাব্য লিখব, বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব, তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার 'পরেই। একজন আর্টিস্‌ট্‌কে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, রীতিমতো স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না। তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

রায়তের কথা

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার “রায়তের কথা’ পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে– কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের যদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষা– কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে-দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে “অদৃষ্ট’। দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্‌স্‌ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী। তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার,

এখন চলছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম “চাই’, আজ তেমনি জোরেই বলছি “চাই নে’। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু “চাই নে, চাই নে’ বলবার হুহুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু “চাই’ জুড়ি তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে-অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল্ বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নিগু□ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জমিদারি, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন– কি শব্দসম্বলে কি অর্থসম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে; আর যাদের অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুগু তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মূলতবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি– তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্‌স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্‌সের সাজ-ফরমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে-ছেঁটে বদলে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি– একেবারে

কেতাবের পাতা থেকে সদ্য-মুখস্থ- কেননা আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেন্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি, এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে; জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার “রায়তের কথা’ স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে- আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভ লগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তার পরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্‌ল্‌ তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেবলের দোষ নয়; ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক; এতবড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হাল ফ্যাশানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে; ঘরে আগুন লাগার

উপমা দিয়ে সে বলছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার “রায়তের কথা’ সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে “খতধন ভশ উয়ক্ষষসন’। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্‌ কম্যুনিজ্‌ম্‌, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি, রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, পিষে ফেলো, দলে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলছে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে! ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে মলেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না– স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে– তাদের সে তর সয় না, তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স্ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে-সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়; এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানিং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে-ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়– কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে

নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দেওয়া যায় না– ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ-অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায়, তাদের “নামে রুচি’ আছে; কিন্তু কাল যখন “জীবে দয়া’র দিন আসবে তখন দেখব, আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হলে তাকে দ’লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটিবদল হয় না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার ‘পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক’রে, উপার্জন না ক’রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক’রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়– এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান

আছে বটে। “রায়তের কথা’য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়তদের বলছি “প্রজা’; তারা আমাদের বলছে “রাজা’– মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব। অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে। জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে-মানুষ বই পড়ে। যে-মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্‌ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু, বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়। সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল করে বসে। অধিকার আছে ব’লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে, মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু, চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে-ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে-লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ

কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে-জমি ততই অল্প-স্বত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না সে-তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীলচাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তা হলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল-খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো। মূল কথাটা এই- রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘরজ্বালানো, ফসল-তছরূপ- কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।

জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা-পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে– এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে-আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন “উচল’ আইনও তার পক্ষে “অগাধ জলে’ পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু ততবড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশুবুদ্ধি নয়। যে-রাস্তায় সর্বদা মোটর-চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম; কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন

দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি, জমিদার নির্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি। কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া- যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপ্‌রি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানি নে- জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিঁকবে কি না সন্দেহ।

আষাঢ়, ১৩৩৩

শক্তিপূজা

“বাতায়নিকের পত্রে’ আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অনুরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ ব’লে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সবচেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে-সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে- সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়করর‍ূপে প্রকাশিত হত। তখন চারদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমতো স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বর‍ূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ-কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খ্রীস্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড্‌ টেস্টামেন্ট্‌ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখ্রীস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখিতে পাই। আজও তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখ্রীস্টানের প্রতি খ্রীস্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার- এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই “শক্তি’ শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না, কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে- অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক- এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে- সে-সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে- “বাতায়নিকের পত্রে’ আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ-কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।-

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

১৩২৬

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুশি কথায় বলো, লেখায় লিখো না। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি, সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করি নে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয় তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে- কেবল উত্তরবায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে-একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি ব'লেই যুক্তি জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ-বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে, যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না; কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণমনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগ্‌বিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে; সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল

যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয় তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি হইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়; লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হল, স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে ব'লে দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল, শর্ত পালন করা হয় নি ব'লেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে শর্ত প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার শর্ত আমরা পালন করি নে ব'লেই স্বরাজ পাই নে, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে তা হলে স্বরাজ পাবার একটা বড়ো ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেকছে ঐখানেই যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন হল না; যদি মিলত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে যে ৩৬৫টা দিন আছে সব কটা দিনই হত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির করে দিলে নেশা লাগে, তাই ব'লে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয় তা বলতে পারি নে।

পাঁজির নির্দিষ্ট দিন অনেক কাল হল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

তা হলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কি। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসর-কাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যারা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কী। দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে তা হলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্‌বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধানভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না– ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর-একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে-কাজ করতে বলা যায় তাতে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠুলে তাকে হয়তো নাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার কাছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আর-এক জেলায় চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু, যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে-চাষী পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষীই তার বালুজমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখাসত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর-এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করি নে- মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে;

সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু “এহ বাহ্য’। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের–স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর-সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট-ঈস্টার্‌নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে; খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই-সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ-উপার্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়োমানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধরেই নেওয়া যাক যে, চাষীরা তাদের অবসরকালে যদি লাভবান কাজে লাগায় তা হলে আমাদের স্বরাজ-লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধরেই নেওয়া যাক, এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সবচেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তা হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষীদের অবকাশকালকে সম্যকরূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসংকট ঘটে তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্‌, আমার উপকার করতে চাইলে এ-কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়তো হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি তা হলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড়ো করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চাওয়ালার মতো আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চাওয়ালার মতো আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখতে বা স্কুলকলেজ-পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকলে হয়তো সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস, চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তাতে আমার সর্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদিবা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে চাষীর দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে তার থেকে তাকে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি, মনের চর্চা যাদের কম গোঁড়ামি তাদের বেশি, সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগবশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে তাতে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে

মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল এটা এই মনে করেই করেছি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হলে তাতে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু, সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেও থাকেন; আমার মতো আনাড়ির সে-তর্কে প্রবেশ করে কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণসাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে, দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকেও ছোটো করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবি লোকের ছবি,

এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবি শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তাকে কেবলই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চার দিকে কেবলই ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধব্যাকরণের সূত্র, তা হলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তার পরে সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা; তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে তোলবার কঠিন দুঃখও মা-বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার-পাঁচ বছর কাটাতে হত, তা হলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর

ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের ‘পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক’রে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর প’রে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টিকরা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এইজন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ্য নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ

করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য-অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্‌যোগকে আমরা আয়তনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি– স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব– আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে– তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিসটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে-মানুষ সুতো কাটছে সেও একলা; তার চরকার সূত্র অন্য কারো সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্তভাবে নিজের চার দিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের

ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন– চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু, যে-মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশোর হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশোর সগোত্র এমন কি সহোদর ভাই। যে-গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন, ১৩৩২

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

দেড় শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধনসম্পদ শিল্প-বাণিজ্য পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কিম্বা তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্তমানের দুঃখ ঘুচিবে না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ, অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনায় আমার দরকার কী যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। এ কথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এতকালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব, তখন এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারী। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে-শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়। যে-সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবি করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সভ্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে-সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। এইজন্যই যে-সব জাত এই আধুনিক সভ্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুশকিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাৎড়ায়; মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্যপ্রণালীতে একটা কিছু লোকসান ঘটিয়াছে, মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে তারা উদ্ধার পাইবে। তাদের বিশ্বাস মানুষের সংসারটা একটা সতরঞ্চ খেলা, বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে বড়ো হার হইতে পারে।

মানুষ একদিন স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোনো-একটি সত্তা আছেন যার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সত্য হইয়াছে। সেইদিন হইতেই তার ইতিহাস শুরু হইয়াছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বলে, এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি, ওটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল, এবং এই ঐক্যবোধই মানুষের কর্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড়ো খেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোটো খেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়, এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত, এবং তার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সংকীর্ণ ছিল।

আর্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতোই ছিল। অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল- সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না, অবশেষে যখন আর্যসাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনি ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিভেদের মধ্যে মিলন আসে কী করিয়া।

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মার সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরো অনেক বড়ো লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুর কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়- এই শিক্ষায় যে-স্বাদেশিকতা জন্মে তার

ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহ-সংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে; সেইখানেই মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর-আর পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্ষায় বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু আমাদিগকে লইতে হইবে; নহিলে আমাদের প্রকৃতি একঝোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সভ্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে, তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। ইহাতে কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না। বালকবয়সে একপ্রকার দুর্দান্ত আত্মম্ভরিতা তেমন অসংগত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে; তখনও যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কী বুঝায়। এতদিন যে-স্বাজাতিকতার সমস্ত

সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এতদিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে। তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে নিজের লাভক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া ইহারা ধর্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধার মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদিগকে ছাঁটিতে আসে। কিছুদিন ও কিছুদূর পর্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ্য করিয়া যায়। তার পরে একদিন হঠাৎ সে সুদে-আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আসে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষ্যে আসে যেটা হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্মের টাকায় ভদ্র সমাজে যে মানুষ গৌরবে বয়স কাটাইল, হঠাৎ একদিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অন্যায় অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড়ো বড়ো সভ্য জাতি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসংগত বলিয়া মনে করে যে, দুর্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ত তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই, য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কুল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক বিলম্বেই হোক তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ

মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কী পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে- নহিলে, তার আমদানি-রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশবিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে; যে-পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল; কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধুলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সনতারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টাপাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী- সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্যসকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।

একদিন ছিল যখন য়ুরোপ আপন আত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে এ কথা বুঝিয়াছিল যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয় কিন্তু অন্তরে সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত, এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং য়ুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড়ো তাৎপর্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্মবিবেকের স্বাধীন

নির্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতালাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তুপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পড়িয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি, য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলায় ধুলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে য়ুরোপ আর-কোনো একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বারম্বার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষালাভের পরে য়ুরোপকে আজ না হয় তো আর-একদিন এ কথা মানিতেই হইবে যে, কেবল কার্যপ্রণালীর পিরামিড-নির্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা; তাহাকে এ কথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের সত্যকে পাওয়া চাই; এ কথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে একদিন জগদ্‌ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহংকারের

সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।

ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায়, এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। এক দিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না; অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনা-বৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ়-রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতম যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়—তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে-দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে-দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম একদিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে

তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল, তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন য়িহুদি ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু, সেই পরাধীন জাতির একজন অখ্যাতনামা অকিঞ্চন যে-সত্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই তো স্তূপাকার বস্তুসঞ্চয়ের উপরে জয়লাভ করিল। য়িহুদি উদ্ধত রোমকে এই কথাটুকু মাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড়ো করিয়া জানো। এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্যসম্পদ অর্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন। বাহিরের জগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারি দিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া যে-নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন, ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহংকার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া যাইবেই; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য এই যে ঃ তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। অন্তরতর এই যে আত্মা, বাহিরের সকল বিত্তের চেয়ে ইহা প্রিয়।

য়ুরোপে ইতিহাস একদিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্য সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সৃজনীশক্তি

সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অদ্যকার ভীষণ দুর্দিনে য়ুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কী দিতে পারে। পূর্বে একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহার বদলে আর-একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড়ো জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না– কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না। যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়। যে-হাত দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তাহার সে হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে– সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলই খণ্ডিত করিবে। এক হাত দিয়া যত দিবে আর-এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে, সে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে-হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে

দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না– সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

য়িহুদি যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদি দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই, সেটা সত্ত্বেও সে বড়ো, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে, এ কথা আমরা বার বার ভুলি কিন্তু তবু ইহা বার বার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায় তবু যাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল। যাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে: তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়– তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মন্টেগু ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন:

তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও; মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্যব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

মাঘ, ১৩২৪

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী, এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন করবার শক্তি রাখেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতবড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে-মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যতক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনারই বা আছে। সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান। প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য। সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে-নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই-যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নিষ্ঠুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ্য করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এতবড়ো হিংসার বোঝা বইবে কী করে। এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সইবে কে।

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না– সংকটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব না এর কাছে মাথা নত করব? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপুর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়– বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের

দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধ দ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হয়ে যায় তবে আগুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে, কূপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না, একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সবচেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে সে আরও কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে– সেইখানেই যে ছিদ্র– ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণের রথযাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে– কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা দ্বারা, সে-রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে? যেখানে গর্তগুলো হাঁ ক'রে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু, এতবড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই, ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনই তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্‌টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি,

রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে– কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ করে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই যে চৈতন্য এসেছে, রিপুর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব না শুভবুদ্ধিদাতাকে বলব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদি গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও!

এই-যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিল এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব। সহসা এ-প্রশ্নের একটা পাকারকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা-আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে; বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য। এসো আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয়। কেননা, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি– এক ঈশ্বরের নামে "আল্লাহো আক্‌বর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব "হিন্দু এসো' তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা– এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি।

বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনও কখনও ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে; বলি, শিখরা তো একসময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্ জাতি সব, শিখধর্মের আহ্বানে একত্র হতে পেরেছিল; বাধাও দিতে পেরেছিল; ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্‌দ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না, পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুষে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করি নে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলি নে? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই– তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না– কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে– কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম

বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে-মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে, সে-মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়। আর তার শ্বাসই বা কতক্ষণ। আজ আমাদের অনুতাপের দিন- আজ অপরাধের ক্ষালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ, ১৩৩৩

হিজলি ও চট্টগ্রাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলির গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়-প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের ‘পরে সেই-সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের

প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের ‘পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে-উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে, এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখার উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।

২

হিজলি কারার যে-রক্ষীরা সেখানকার দু জন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের ‘পরে এত বেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের

কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এইসব অত্যন্ত চড়ানাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ন আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে; এদের বাসা আরামের, আহারবিহার স্বাস্থ্যকর; এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই- সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি, এবং লোভ ক্লেশ ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃত কার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এরকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্‌ভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না; করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারি হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয়, এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশান্তির আশা পোষণ করছে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধি-ব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে-ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ-প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি-প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়– এমন কি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোনো কঠোর

দায়িত্ব কল্পনা করে নেয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও যেন মনে স্থির রাখে যে, সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুলমাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছে, এবং এও বলা বাহুল্য যে সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ– অনতিকাল পূর্বে আয়র্লাণ্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বে-আইনি অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্মেন্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তিপ্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এরকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক– এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

কার্তিক, ১৩৩৮

হিন্দুমুসলমান

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব ব'লে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার-নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানারকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তক্‌রার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি-বা আধরাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁস হল, এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উলটে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে-আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে।

যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে-দেশ হতভাগ্য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে।

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ।

দেড়শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্‌মূলিত করে নি কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে ধর্মের নামে। পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃষ্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশের প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষ্যে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে

বেড়াই তা সংস্কারগত অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনও নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খৃস্টান তা হলে যে-ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এণ্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশনিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে এণ্ড্রুজের আচারবিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে– ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়।

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি, আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, ধর্মে-

কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই। এর ফল ফলছে; আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসীতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসীর উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী। গরজ আমাদের যতই থাক্, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা

কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি। বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারি করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন, এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপোষ করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এপর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, একজনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেষণে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানব-প্রকৃতিতে সেই অবিচার

সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝোঁকা আপোষ করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না, কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ন রাখাই আপাতত সবচেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না। এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলো আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতিস্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না, তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়ে ভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন কি পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে।

যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গাম বাধে নি কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোর্‌বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু- মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু “এহ বাহ্য’। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব,

মানুষ ব'লেই মানুষকে আপন ব'লে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি, এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ-পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে-মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক্‌– আমরা মুসলমানকে কাছে

টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে-তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা-ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে; অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে-দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এইরকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায় নি। বৃটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের রতং তশধ যক্ষধনক্ষ পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এইরকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরও আঁট করে তোলা মূঢ়তা।

বর্তমানের ঝাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দু-মূসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্‌যোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সবচেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্সি-সমাজ সাধারণত শিক্ষিতসমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সাম্‌লানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের উপায় উদ্‌ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থাপরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে

ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

শ্রাবণ, ১৩৩৮